ঘোষণাপত্র
ও
গঠনতন্ত্র

১৯৬৩ সালের ১৭, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত এবং ১৯৬৫ সালের এপ্রিল, ১৯৬৬ সালের নভেম্বর, ১৯৬৯ সালের জুলাই, ১৯৭০ সালের অক্টোবর, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮২, ১৯৮৪, ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭, ২০০০, ২০০১, ২০০৩-২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনসমূহের সংশোধিত ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র।

মূল্য : ৩০ টাকা
প্রকাশক : লেনিক চাকমা
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংসদ
ডাক যোগাযোগ : মধুর ক্যান্টিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল : ০১৬৮৬ ৬৩ ৯৫ ১২
ই-মেইল : bsu.media@yahoo.com

অক্ষর বিন্যাস : লেখনী কম্পিউটার্স
মুক্তিভবন (৬ষ্ঠ তলা), ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৮৬১২, ফ্যাক্স : ৯৫৫২৩৩৩

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

ভূমিকা

মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, বর্তমানের বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তা ছিল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনের পরিণতি। এই প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে এ দেশের ছাত্র আন্দোলনে সূচিত হয় দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী ধারার।

জন্মলগ্ন থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের অবসান, সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি এবং দেশে একটি সুখী-সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ও আপসহীন লড়াই পরিচালনা করে আসছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে নিবেদিত আমাদের প্রতিষ্ঠান সর্বদাই ছাত্র-জনতার সুখ-দুঃখের সাথী। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের সবচেয়ে সচেতন, অগ্রসর ও সংগ্রামী প্রতিনিধি হিসেবেই আজ বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত।

যারা মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তান কেবল ভৌগোলিকভাবে আলাদা, স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেই দেশের মানুষের কোনো সমস্যা-সঙ্কট থাকবে না, সকলেই সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে– আমরা তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম না। আর তাই জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম পাকিস্তানি একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠী, প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকারী রাজনীতিবিদ এবং তাদের আন্তর্জাতিক মোড়ল সাম্রাজ্যবাদ–বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। এদের সঙ্গে ছিল সামন্ত-ভূস্বামী গোষ্ঠী এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল শক্তি সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র। সাম্প্রদায়িকতা এবং তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছিল তাদের ঘৃণ্য ভাবাদর্শগত হাতিয়ার।

'৫২ থেকে '৯০ পর্যন্ত এ দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল ছাত্র সমাজের ত্যাগ, নিঃস্বার্থ আত্মদান, বলিষ্ঠতা,

সাহসিকতা ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মহিমায় ভাস্বর। সেই আন্দোলনকে অগ্রসর করতে গিয়ে যাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের সামনের কাতারে ছিল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সদস্যবৃন্দ তথা গোটা সংগঠন। আমরা মনে করতাম সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতিকে নির্মূল করতে না পারলে এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে জাতির প্রকৃত মুক্তি হবে সুদূর পরাহত। আর এজন্য দরকার আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ, সৎ-নিঃস্বার্থ-নিষ্ঠাবান সচেতন কর্মী বাহিনী ও সেই সঙ্গে ব্যাপক দেশপ্রেমিক মানুষের জাগরণ। আমাদের সে কথা সত্য প্রমাণিত হয় যখন দেখি স্বাধীনতার চার দশক পরও মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আসে না, মুক্তি আসে না। সেই সত্যের নির্মম চাবুক সকলকে আঘাত করে যখন দেখি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী চক্র, সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে আবার দেশের বুকে তাদের অশুভ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এমনকি স্বাধীনতাকেও বিপন্ন করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং এদেশে তার সহযোগীদের ঘৃণ্য চরিত্র ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারলে, তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকলে, নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সচেতনভাবে মোকাবেলা করলে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির সামনে যে করণীয় উপস্থিত হয় তা সম্পাদনে সঠিক নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও যে কোনো কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত থাকলে, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ভাড়াটেরা '৭১-এর স্বাধীনতার ধারা উল্টাতে পারতো না। স্বাধীনতার পর গৃহীত প্রগতিশীল নীতিসমূহ এতদিনে দেশের রাজনীতিতে, অর্থনীতি-সমাজ জীবনে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হতো।

কিন্তু দেশকে ঠেলে দেয়া হয় উল্টো পথে। শহীদের স্বপ্ন, জনগণের

আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুলুণ্ঠিত হয়। লুটেরা ও পরজীবী ধনিকগোষ্ঠী, সামন্ত-ভূস্বামী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষার নীতি নিয়ে শাসকগোষ্ঠী চলতে থাকে। এদেরই স্বার্থে এ দেশে বারবার সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে। হত্যাকান্ড, ক্যু ও ষড়যন্ত্র হয়ে ওঠে শাসন ক্ষমতা বদলের উপায়। আমাদের দেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ সামরিক জান্তাকে, স্বৈরাচারী শাসনকে কখনোই মেনে নেয়নি। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশে যখন নতুন করে সামরিক শাসন জারি করা হয়, তখনও ছাত্র সমাজ গর্জে ওঠে। আকাঙ্ক্ষিত গণমুখী-প্রগতিশীল শিক্ষানীতির জন্য, স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তোলে এবং স্বৈরাচারের পতন অনিবার্য করে তোলে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের পতন ঘটে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। ছাত্র সমাজ ছিল এই সংগ্রামের সামনের কাতারের সৈনিক।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বিপ্লবী ঐতিহ্য অনুসরণ করেই আমাদের প্রতিষ্ঠান ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। '৯০-য়ে স্বৈরাচারের পতনের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে গেছে বুর্জোয়া রাজনীতির দেউলিয়াপনার কারণে। ছাত্র সমাজের ১০ দফা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যান্য পেশার মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবিও উপেক্ষিত হয়েছে। জনগণের ওপর নতুন নতুন কালো আইন চেপেছে। ছাত্র আন্দোলন যেন জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম, শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের মুক্তি তথা সমগ্র জাতির প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামের ধারায় মিলিত হয়– তার প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিগত বছরগুলোতে অবিরাম আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছে। তেভাগা আন্দোলন, টংক-নানকার প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর

গণঅভ্যুত্থানসহ শ্রমিক-কৃষক-নারী-ছাত্র-জনতার বিভিন্ন গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। অতীত আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে আমরা এখনো বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করছি। ১৯৯৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয় যা ছাত্র আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের চাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও অভিযোগ সেল গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ২০০৭ সালের ২০-২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র বিদ্রোহ ও ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির আন্দোলন, ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ সাজার দাবিতে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্ব দিয়েছে ও বিজয় অর্জন করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-ফি বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সান্ধ্যকালীন কোর্সের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন অপরাপর শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। এছাড়াও দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণিত হয়েছে যে, জেল-জুলুম, নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদী নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড কোনো কিছুই ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

শত্রুকে এবং সমস্যার উৎসকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ বদলের বিপ্লবী রাজনীতিকে অগ্রসর করার জন্য সৎ-ত্যাগী-সচেতন কর্মী সৃষ্টি, যে কোনো বাধা অতিক্রম করার দুর্দমনীয় সাহস; দোদুল্যমানতা, আপসকামিতা, ভীরুতা, উগ্রতা ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে নিরলস রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ও জনগণকে সংগঠিত

করা– এ সবকিছুই জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারণ আমরা জানি শত্রুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে, সমস্যার উৎস খুঁজে না পেলে শত্রুকে নির্মূল করা যায় না। তেমনি সচেতন, আত্মত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনীর সংগঠন না থাকলে, সত্যকে অকুতোভয়ে প্রকাশ করার সাহসের অভাব ঘটলে, ছাত্র সমাজ ও জনগণকে সচেতন-সংগঠিত-ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলেও চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনা যায় না। দেশ ও জনগণের শত্রুরা শক্তিশালী। তাদের রয়েছে নানা অপকৌশল ও হাতিয়ার। এই শত্রুদের মোকাবেলা করে আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাজীবনসহ প্রকৃত সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার জন্যই এই ঘোষণাপত্র।

১৯৭৩ সালে ঘোষণাপত্র আংশিক পরিবর্তন করে ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ জাতীয় সম্মেলনে এ ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলনের অনুমোদনক্রমে পুনর্লিখিত আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত ২২তম জাতীয় সম্মেলন, ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ২৫তম জাতীয় সম্মেলন, ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ২৬তম জাতীয় সম্মেলনে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সামান্য সংশোধিত হয়। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত ২৭তম জাতীয় সম্মেলনের অনুমোদনক্রমে পুনর্লিখিত হয়। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ২৮তম জাতীয় সম্মেলন ও ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ২৯তম জাতীয় সম্মেলনে সামান্য সংশোধনীসহ, ২০০৪ সালে ৩০তম, ২০০৬ সালে ৩১তম, ২০০৯ সালে ৩৩তম, ২০১১ সালে ৩৪তম, ২০১৪ সালে ৩৬তম, ২০১৫ সালে ৩৭তম, ২০১৭ সালে ৩৮তম এবং ২০১৯ সালে ৩৯তম জাতীয় সম্মেলনে সংশোধিত ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র ৯ জুন ২০২৩-এ সমাপ্ত ৪১তম জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হলো।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
কেন্দ্রীয় সংসদ
জুলাই, ২০২৩

পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা কয়েক কোটি শিক্ষার্থী বুক ভরা আশা নিয়ে, সুখী ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিদিন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করি। আমাদের চোখে-মুখে অনেক স্বপ্ন। আমাদের মাঝ থেকেই সৃষ্টি হবে আগামী দিনের কৃতি ব্যক্তিত্ব– শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, রাজনীতিক, রাষ্ট্রনায়ক। আমরাই আগামী দিনে দেশের কোটি কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাবো।

কিন্তু শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্কুল থেকে কলেজে, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা উচ্চ শিক্ষায়তনে পৌঁছাতে আমাদের স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। যতোই দিন যেতে থাকে, ততোই নতুন নতুন সমস্যা-সঙ্কটের ঘূর্ণিপাকে আমরা ঘুরপাক খেতে থাকি।

কিন্তু আবার আমরা আশায় বুক বাঁধি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্বিপাক-আমাদের মতো তরুণদের মেরুদন্ড ভাঙতে পারে না। সকল বাধা অতিক্রম করে আমরা নতুন করে সোনালি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিই। আমরা তরুণ, আমাদের জীবনের সবেমাত্র শুরু। আমাদের সামনে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

রাষ্ট্রের কারো কারো নীতি ও কার্যকলাপের ফলে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে যায়। যারা দেশের অগ্রযাত্রার পথে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে, তারাই আমাদের শত্রু। এই শত্রুকে পরাভূত করেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

পরাধীনতার অর্গল মুক্ত নতুন দেশ : নতুন আশা

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছে এ ভূখন্ডের মানুষ। সিপাহি বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, সাঁওতাল-গারো-হাজং প্রভৃতি জাতিসত্তার বিদ্রোহ, সূর্যসেন-প্রীতিলতা প্রমুখ বিপ্লবীর নেতৃত্বে সংঘটিত অগ্নিযুগের সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী

আন্দোলনসহ জনগণের বহুমাত্রিক সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। '৪৭-য়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও, সাম্প্রদায়িক ও দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ধনিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে আমাদের দেশকে প্রায় ২৪ বছর ধরে লুণ্ঠন করেছে। তারা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। দেশে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, চাষাবাদ পদ্ধতি রয়ে গেছে সেকেলে। আমাদের পাট, চা, চামড়া, খাদ্যশস্যের ভান্ডার লুট করে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা আরো ধনী হয়েছে। আমাদের অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন নতুন শহর হয়েছে, মরুভূমি শস্য-শ্যামলা হয়েছে। অথচ যে কৃষক পাট উৎপাদন করে, তার জীবনে আরো দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থে সিন্ধু নদে বাঁধ তৈরি হয়েছে, কৃষি সেচের ব্যবস্থা হয়েছে–কিন্তু আমাদের দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি। আমাদের দেশ পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানের শিল্পপণ্যের বাজারে। এর বিনিময়ে এখান থেকে তারা নিয়েছে কোটি কোটি টাকা মুনাফা। কিন্তু আমাদের দেশে একটি কাঠপেন্সিল তৈরির কারখানাও তারা হতে দিতে চায়নি। যখনই এর প্রতিবাদ করেছি, তখনই তারা পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু এ দেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কি অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে দমন করা যায়? পাকিস্তানি শাসকদের জাতিগত শোষণ, দমন-পীড়ন ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছে। বারবার এ দেশের ছাত্রসমাজের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, কৃষক-শ্রমিকের রক্ত ঝরেছে।

অবশেষে দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ লাভ ঘটে ১৯৭১ সালে। এ দেশের নারী-পুরুষ, দামাল-তরুণ-যুবক সকলে এক মরণপণ সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, সৈনিক, পুলিশ, বিজিবি(ভূতপূর্ব বিডিআর ও ইপিআর), আনসারসহ দেশের আপামর জনতার লড়াই এবং অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ, ৩০ লাখ বা তার অধিক শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে আনি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের দেশের

নারীদের উপর পরিচালনা করে পদ্ধতিগত নির্যাতন। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তারা বেছে নেয় ধর্ষণকে। বাঙালি ও বাংলাদেশির রক্ত পরিশুদ্ধ করে সহি ও খাঁটি মুসলমান বানানোর অভিপ্রায়ে ২ লাখ (মতান্তরে ৪ লাখ) নারীর উপর পরিচালিত হয় ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন নিপীড়ন। ঘৃণ্য এই কাজে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করে রাজাকার, আলবদর, ইসলামি ছাত্রসংঘসহ (বর্তমানে ইসলামি ছাত্র শিবির) অন্যান্য সহযোগীগণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পূর্ণ মদদ পেয়েও পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়। তারা অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় মুক্তিবাহিনীর কাছে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থনে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আমরা জয়ী হই। এ দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে যে স্বপ্ন লালিত হয়েছে, রক্তের দামে সেই স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা নতুন স্বপ্নে, নতুন দর্শনে আমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার শপথ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকি।

মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই, সুশিক্ষা, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা– এই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের স্বপ্ন। বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ আমাদের প্রিয়জনকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে না–নতুন দেশে এই ছিল সকলের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বিশাল জনশক্তি, উর্বর মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা আমরা খেয়ে-পরে বাঁচবো; শিক্ষা, চিকিৎসা, মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবো; দেশ এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের দিকে– এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ মানুষের আত্মপ্রেরণা। আমাদের শ্রম আর ঘামে, উদ্যম আর অনুপ্রেরণায়, মেধা আর প্রতিভার দ্বারা আমরা গড়ে তুলবো শিল্প-কারখানা ও বৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থা, নতুন সভ্যতা এবং এই লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ঘটবে গণমুখী-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির– এটাই ছিল আমাদের যুগ যুগের আশা। ভিক্ষার হাত নয়, কোটি কোটি মানুষের হাত স্রষ্টার হাতে রূপান্তরিত হবে। আত্মনির্ভর, আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবে আমাদের দেশ।

নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম, আপ্রাণ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং প্রয়োজনে নিজেদের উৎসর্গ করে আমরা লাখ লাখ শহীদের স্বপ্ন ও দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন দেশে বাস্তবায়িত করতে চাই।

স্বাধীন দেশেও আশা পূরণ হয়নি

আমাদের এই ভূখণ্ডে দেড়শ বছরেরও আগে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়েছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। কিন্তু দেশ অথবা দেশের মানুষের কোনো উন্নতি হয়নি। বরং দিন দিন আরো অবনতি ঘটেছে। সুশিক্ষাই একটা জাতির অগ্রগতির অন্যতম শর্ত। কিন্তু কেন আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি– এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর মনে জেগে ওঠে। লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীন দেশ জন্ম নিল সেই দেশে চার দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমাদের কোনো আশা পূরণ হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একটার পর একটা সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। সকলেই ভেবেছেন এবার নিশ্চয়ই দেশের উন্নতি হবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সকল আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। স্বাধীন দেশের যাত্রার শুরুতেও সবাই আশায় বুক বেঁধেছিল, কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। এখনও দেশে শহর ও গ্রামের লাখ লাখ শিশুর পরনে কাপড় নেই, আগামীকাল কী খাবে তার নিশ্চয়তা নেই। তারা বেঁচে থাকবে কি থাকবে না, মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে কি উঠবে না– তার নিশ্চয়তা নেই। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কোনো প্রকারে বেঁচে আছে মাত্র। তাদের কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই; যেমন নেই তাদের উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-কাজ ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা। বেকার যুবকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। প্রতি বছর শ্রমবাজারে ২৭ লাখ শিক্ষিত যুবক প্রবেশ করছে। অনাহারে-অপুষ্টিতে-বিনা চিকিৎসায় হারিয়ে যাচ্ছে কত মূল্যবান জীবন! লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ।

যে কৃষক স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত দিল তার ঘরে সুখ আসেনি। যে শ্রমিক-ছাত্র-মেহনতি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে অংশ নিল, তাদের কিছু হয়নি। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মানুষের ওপর শোষণ করে মুনাফা লুটে ফুলে-ফেঁপে ধনী হয়েছে। তারাই দেশের যাবতীয় সুখের-বিলাসের-ভোগের ও আনন্দের অধিকারী হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবেই সকলের প্রশ্ন- এর সমাধান কোথায়?

স্বাধীনতার চার দশক পরও বাংলাদেশের সবার জন্য ন্যূনতম মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ও শাসকগোষ্ঠীর গণবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও যেসব ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা এই দেশের মজুর-কিষান ও আপামর জনগণের অপার সৃষ্টিক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেমের ফলেই অর্জিত হয়েছে। অথচ শাসকগোষ্ঠী জনগণকে উপহার দিয়েছে অনিয়ম, অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য। তাই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষের মনে বিরাজ করছে গভীর হতাশা ও ক্ষোভ। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করে, প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে ও গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত রাখার মাধ্যমে সরকার পরিস্থিতিকে ঠান্ডা রাখতে সক্ষম হলেও প্রকৃত অবস্থা তা নয়। ভেতরে ভেতরে জমছে ক্ষোভ। 'এই নৈঃশব্দ যেন যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতি'।

দেশের লুটপাটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার অনুষঙ্গী গণতন্ত্রহীনতার ফলশ্রুতিতেই যেহেতু জন্ম নিয়েছে অনিয়ম-অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য, সেজন্য পরিস্থিতির দাবি হলো গোটা অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। অভিজ্ঞতা এ কথা বলে যে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তির শ্রেণিগত চরিত্র বদল না হলে এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক নীতি-দর্শনের প্রগতিমুখী মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তাই আজ লুটেরা বুর্জোয়া রাজনীতির ক্রমশ একনায়কতন্ত্র অভিমুখী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী শাসনকে পরাজিত করে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি ও গণশক্তির সচেতন সংগঠিত উত্থান ছাড়া বর্তমান দুঃসহ অবস্থার মৌলিক ও স্থায়ী কোনো পরিবর্তন সম্ভব হবে না।

সর্বগ্রাসী সঙ্কট

পরাধীন আমলে আমাদের দেশ ছিল প্রথমে ব্রিটিশের ও পরে পাকিস্তানের বাজার। এখানে কোনো শিল্প-কারখানা গড়তে দেয়া হয়নি। প্রতিটি জিনিসের জন্য আমরা হয় পাকিস্তান না হয় অন্য কোনো দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। শিল্প-ব্যাংক-বিমা-ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই থেকে যায় প্রথমে ব্রিটিশ বেনিয়া ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানি বাইশ পরিবারের হাতে। ফলে অর্থনীতি থেকে যায় চরমভাবে পশ্চাৎপদ ও কৃষিনির্ভর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও শিল্পের সামান্যই বিকাশ ঘটছে। সরকারি নীতি, গাফিলতি ও প্রশাসনের দুর্নীতির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়নি। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের এবং বিশেষভাবে '৮২ সালের সামরিক শাসনের পর রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক কল-কারখানা নামমাত্র দামে ধনিক শ্রেণির হাতে তুলে দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর নির্দেশে বেসরকারিকরণের ফলে কয়েক হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্পায়নের নামে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবার শ' শ' কোটি টাকা সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিলেও তারা শিল্প স্থাপনের জন্য সামান্যই ব্যয় করেছে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ দেশ যাদের শিল্পপণ্যের বাজার, সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোও আমাদের দেশের শিল্পায়ন চায় না। উপরন্তু দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের এবং আমদানিকৃত খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ যোগানের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর নানা শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করছে।

কৃষি ক্ষেত্রে শত বছরের পুরনো ব্যবস্থা চলে আসছে। কৃষির সঙ্গে জড়িত ৬২ শতাংশের বেশি মানুষ ভূমিহীন। অল্প জমির মালিক গরিব কৃষকরা ক্রমেই জমি হারা হচ্ছে। দেশের মাত্র ৩৭ শতাংশ মানুষ মোট ভূসম্পত্তির প্রায় অর্ধেকের মালিক। জোতদার, বৃহৎ ভূস্বামী, মহাজনদের শোষণে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক জর্জরিত। ধনী কৃষকদের হাতে সেচ সুবিধা, সার, ব্যাংক ঋণ প্রভৃতি তুলে দেয়া হলেও কৃষি উৎপাদন বাড়ছে না, বরং গ্রামাঞ্চলে চলছে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া।

প্রতি বছরই খাদ্যশস্যের বিপুল পরিমাণ ঘাটতি থাকছে। সরকারি ট্যাক্সের বোঝা দরিদ্র কৃষকদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠছে। টার্মিনেটর প্রযুক্তি, জিএস শস্য, হাইব্রিড বীজের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কৃষি ব্যবস্থার ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। সাম্রাজ্যবাদের অশুভ তৎপরতাকে ছাত্র সমাজ মেনে নিতে পারে না।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর লুটেরা ধনবাদী ধারায় দেশ পরিচালিত হওয়ায় দেশে অবাধ লুটপাট চলছে। দেশের নিয়ন্ত্রণ আজ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তথা অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতির হিংস্র থাবায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি। বাংলাদেশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে অসম বাণিজ্যের নির্মম শিকার। আমরা তাদের কাছে যা বিক্রি করি তার ন্যায্য দাম পাই না। অন্যদিকে তাদের পণ্য কিনতে হয় চড়া দামে। দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু এবং শিল্প ও কৃষির বিকাশ রুদ্ধ করে চিরকাল তাদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখতে তারা তৎপর রয়েছে। হতদরিদ্র এ দেশে সামরিক ব্যয় বরাবরই শিক্ষা ব্যয়ের চেয়ে বেশি। এ জন্য তারা বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ'র মাধ্যমে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একদল অনুচর সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের এক ধরনের ধনিক ব্যবসায়ী, কিছু সংখ্যক আমলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদরা দেশে সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ চালাতে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তেল-গ্যাস-চট্টগ্রাম বন্দরসহ জাতীয় সম্পদ নানা অসম চুক্তির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানি তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে তুলে দেয়া হচ্ছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে এভাবে তারা ধনী হচ্ছে। অক্সিডেন্টাল, নাইকো প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানি গ্যাস পুড়িয়ে ধ্বংস করছে আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ। দারিদ্র্য দূরীকরণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বদলে সাম্রাজ্যবাদী দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শক্রমে পিআরএসপি' আলোকে

তৈরি হচ্ছে বাজেট। দেশ ও জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে এভাবে তারা ধনী হচ্ছে। ছাত্র সমাজ তা মেনে নিতে পারে না।

রাজনীতি

রাজনীতিতে চলছে দুর্বৃত্তায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ। কালো টাকা, সন্ত্রাসের নষ্ট বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি। জনগণের মধ্যে যথাযথ শিক্ষা, নিজেদের ও জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা ও উন্নত রাজনৈতিক চেতনা না থাকা, মানুষের মধ্যে পুরনো ধ্যান-ধারণা ও নানা ধরনের কুসংস্কার থাকা এবং সাধারণভাবে গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণ সংগঠিত না থাকার সুযোগে গণবিরোধী গোষ্ঠীগুলো নানা প্রকার ষড়যন্ত্র চালাতে পারছে। যারা আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ বড় করে দেখে, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেয়, মানুষের কল্যাণ দূরে ঠেলে রেখে জনগণের ভাগ্যকে বিদেশি শোষকদের হাতে সঁপে দেয়, সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ ও বিপ্লবী পরিবর্তন চায় না, তারাই দেশের রাজনীতি দখল করে রাখে। রাষ্ট্র ক্ষমতায়, প্রশাসনে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে এমনকি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে এরা তাদের কায়েমি স্বার্থ বহাল রেখেছে। তাই দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যারা জনগণের প্রকৃত মুক্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদের সামনে হাজারো বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদের দমন করার জন্য হত্যা, নির্যাতন, ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে; দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা, '৭১-এর গণহত্যার মূল হোতারা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে তৎপর রয়েছে। যে কোনো মূল্যে এদের ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। দেশের সার্বিক সঙ্কট দূর করতে দেশপ্রেমিক-বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান ঘটাতে হবে।

সামাজিক অবস্থা

ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারি এবং নানাবিধ অনাচার ও দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি একটা অলিখিত আইনে পরিণত হয়েছে। এই দুর্নীতির কারণেই অপরাধী সমাজদ্রোহী ব্যক্তিরা সমাজে অবাধে চলাফেরা করতে পারে। অন্যদিকে গরিব ও সহায়হীনরা আরো দুঃখ-কষ্ট ও সামাজিক অবিচারের সম্মুখীন হচ্ছে। জনগণের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। নারী সমাজ এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

ছাত্র-যুবকদের চরিত্র হননের জন্য সুকৌশলে নৈতিকতাবিরোধী কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ভোগবাদ, অপসংস্কৃতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, পণ্যমানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি নেতিবাচক সামাজিক মনস্তত্ত্বের জন্ম হচ্ছে। এর শিকার হয়ে ছাত্র-যুব সমাজের অংশবিশেষ এবং এমনকি কিছু কিশোরও আত্মবিশ্বাস, ন্যায়-নীতি বোধ, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পরিবার-সমাজ-দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সততা ও শিষ্টাচার থেকে দূরে সরে গিয়ে সমাজে নতুন সঙ্কটের জন্ম দিচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব এবং প্রকৃত দেশপ্রেমের অভাবে দেশের সর্বত্র এক ধরনের ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে। বেকারত্ব-হতাশা-দারিদ্র্যের কারণে যুব সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ সন্ত্রাস ও মাদকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ৬৫ লাখেরও বেশি মানুষ বর্তমানে মাদকাসক্ত। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

ভাষা আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্য এবং দীর্ঘদিনের জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস থাকলেও আজ পর্যন্ত সর্বস্তরে যেমন বাংলা ভাষা চালু হয়নি, তেমনি বাঙালিসহ অপরাপর জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি। পক্ষান্তরে অপসংস্কৃতি, অনুকরণ

প্রবৃত্তি, ধর্মের নামে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকৃতি আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। জীবনবিমুখ-ভোগবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমাদের মানবিক-লোকায়ত সাংস্কৃতিক ধারা।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচররা তাদের শোষণের স্বার্থেই যে কোনো জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানি আমলের মতো এখনো সেই আঘাত চলছে। ছাত্র সমাজকে এই আঘাত মোকাবেলা করতে হবে। মানবিক-লোকায়ত, গণমানুষের সাংস্কৃতিক ধারাকে বিকশিত করতে হবে।

নারী সমাজ

নারী সমাজ বর্তমানে চরম হতাশা, দারিদ্র্য, অসহায়ত্বের মধ্যে রয়েছে। নারীরা দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। নারীরা প্রতিনিয়ত দৈহিক, মানসিক, যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, যৌতুক, তালাক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানাভাবে নারীর ওপর নির্যাতন চলছে। ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক-অবমাননাকর চিত্র তুলে ধরে নারীকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। প্রতি বছর দেশে গড়ে ১৬ শতাংশ হারে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধস্তনতা দূর করে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা কাঙ্ক্ষিত নারীমুক্তি অর্জনের জন্য বিদ্যমান পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

পরিবেশের সঙ্কট

পারমাণবিক পরীক্ষা-বিস্ফোরণ, দূষিত বর্জ্য নিক্ষেপ, অপরিকল্পিত নগরায়ন-শিল্পায়ন ও মুনাফাসর্বস্ব বাণিজ্যের কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুঁজিবাদী উন্নয়ন ধারায় প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ

পুঁজিবাদী বিশ্বের আধিপত্যবাদী চক্রান্তের কারণে তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশের সঙ্কট বেশি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও ঋতু বৈচিত্র্য পরিবর্তিত হওয়ার লক্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানি অনুসৃত পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল আবাদ, চিংড়ি চাষ গ্রামীণ পরিবেশকে বিপন্ন করছে। পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে পাখি, মাছ মারা যাচ্ছে; বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অবাধে বনভূমি উজাড়, পাহাড় কাটা, নদী ভরাট, বর্জ্য নিক্ষেপ, অপরিকল্পিতভাবে বহুতল ভবন, বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ পরিবেশের বিপর্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর্সেনিক সমস্যা, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ বাংলাদেশে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিবেশ-প্রকৃতি-জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

শিক্ষা সঙ্কট ও সমস্যা

শিক্ষার সমস্যা সর্বব্যাপী, নানামুখী। যেদিকেই লক্ষ্য করা যায় সেইদিকে সমস্যা ও সঙ্কট। তবুও সাধারণভাবে শিক্ষার সমস্যা মূলত ৩ রকমের।

(ক) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন করা। এই লক্ষ্যে আমাদের সমাজে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন তা ব্রিটিশ, পাকিস্তানি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আমলে কার্যকর করা হয়নি। শুধু লিখতে ও পড়তে জানা বা কোনো কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্যই শিক্ষা নয়। সেই সঙ্গে প্রগতিশীল জাতীয় চেতনায়, দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগে, সততা ও নিষ্ঠায় এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই শিক্ষা। আগামী দিনের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য– এক কথায় সুন্দর ও সুষ্ঠু দেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিসর্বস্ব চিন্তা, অসততা, দুর্নীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। নিজের দেশকে জানার, ভালোবাসার কোনো শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই।

(খ) কোনো নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি প্রগতিমুখী সুসভ্য জাতিতে পরিণত হতে পারে না। আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগের বেশি মানুষ লিখতে-পড়তে পারে না। দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড বলে পরিচিত যে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ- তারা ও তাদের ছেলেমেয়েরাই লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ধনী ও গরিবের মধ্যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য বিদ্যমান। একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। উচ্চবিত্ত ও সাধারণদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও বাস্তব উপযোগিতাহীন ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি এখন বিদ্যমান। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৮%, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬২.৪৫%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২১.৫৫% এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৬.৭% ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া থেকে ঝড়ে পড়ে (ড্রপ-আউট)।

সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলেই দেশের কৃষক-শ্রমিক সকলেই দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী ও নিজেদের সার্বিক স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হবে। নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হলে মেহনতি মানুষের মুক্তি নেই। তাদেরকে স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

(গ) শিক্ষার তৃতীয় প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা। বাংলাদেশের যে কোনো সাধারণ ছাত্রের সমস্যা কী? এই সমস্যা হলো দরিদ্র অভিভাবকের আয় কম। অন্যদিকে শিক্ষার ব্যয় বেড়েই চলেছে। ফলে অনেক ভালো মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব হয় না অথবা লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র বেতন, পরীক্ষার ফিস ও অন্যান্য খরচের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বইপত্র, কাগজ-কলম ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণের দাম বেড়ে চলেছে। হল-হোস্টেলের খরচও দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের জন্য বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও পাসের হার বাড়লেও শিক্ষা ব্যবস্থা তার গুণগত মান হারাচ্ছে। লেখাপড়ার মান কমে যাওয়া এবং স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে কোচিং বাণিজ্য ও প্রশ্নফাঁস। যারা বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখার খরচ কুলাতে পারছে না, ভালো ফল করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর তাই গরিব ছাত্রদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। শিক্ষার ব্যয় বাড়লেও গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়ানো হয়নি, বরং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল '৯২ পাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথকে আরো উন্মুক্ত করা হয়েছে। যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যার নেই কোনো অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি ও টিউশন ফি নীতিমালা। শিক্ষা পরিণত হয়েছে পণ্যে। যাতায়াতের খরচ বেড়ে গেছে অনেক। পরিবহনে কনসেশনও দেয়া হয় না।

সন্ত্রাসের অসুস্থ বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েছে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি, অপহরণ, ধর্ষণের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা বোর্ড, টেক্সট বুক বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা বিভাগ ও মন্ত্রণালয় হচ্ছে দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা, দায়িত্বহীনতা ও আলসেমির কারখানা। তাদের ব্যর্থতার কারণে কতো ছেলেমেয়ের যে অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে, তার কৈফিয়ত দেবে কে? অনেক স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল ও টেকনিক্যাল কাজে অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে লাইব্রেরি, গবেষণাগার নেই। ছাত্রদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা সফর ও ছুটির সময়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যয় বহন করার সুযোগ-সুবিধা নেই। যার ফলে

একজন ছাত্রের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভ কঠিন হয়ে পড়ছে।

ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্কুল-কলেজে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ গঠনের অধিকারও সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনও খর্ব করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা

নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কোনো সরকারি উদ্যোগ নেই। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশগুলো কোনো প্রকারে টিকে আছে। অসংখ্য প্রাইমারি স্কুলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। অথচ ধনীদের সন্তানদের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিলাসবহুল ও ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজ চালু করেছে। সর্বত্রই ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে। শিক্ষা বাজেটের বিরাট অংশ যাচ্ছে ক্যাডেট কলেজগুলোতে। অথচ গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। ফলে তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গ্রামের ও শহরের ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষকদের সমস্যা

একজন শিক্ষক যখন নিজের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারেন না, তার চেয়ে দুঃখের আর কী আছে! শিক্ষকদের বেতন এতই কম যে, নিশ্চিত মনে তারা ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারেন না। গত কয়েক বছরে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। উপযুক্ত মর্যাদা না থাকায়, সরকারের অপরিণামদর্শী নীতির কারণে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের পক্ষে টিকে থাকা বা মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের মূল দাবি

১. শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন শিশু অবস্থাতেই ছাত্ররা সুস্থ জাতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। নিজের দেশ ও দেশের গৌরবগাঁথার সঙ্গে পরিচিত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত হতে পারে।

২. শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন, ছাত্রদের মৌলিক জ্ঞান দান, সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, সততা-ন্যায়নিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন এবং শারীরিকভাবে যোগ্য করে তোলা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক চাহিদা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩. সমগ্র দেশে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা চালু করতে হবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। সরকারি বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়াতে হবে। অর্থনৈতিক কারণে যাতে কারো লেখাপড়া বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পাঠ্যবই, কাগজ-কলমসহ শিক্ষা উপকরণ কম দামে ছাত্রদের হাতে পৌঁছাতে হবে। ছাত্র বেতন, পরীক্ষার ফিস ও নানাবিধ অযৌক্তিক ব্যয়ভার কমাতে হবে।

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের প্রতিটি মানুষকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৫. নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষকদের কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত করতে হবে। ছুটির সময় পুনর্বিন্যাস করে ছুটির সময়ে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

৬. শিক্ষার সকল স্তরে পাঠ্যসূচি বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৭. নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে নারী সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. অনুৎপাদনশীল ও বিলাস খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষাখাতে ইউনেস্কো'র সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ৮% বরাদ্দ করতে হবে।

৯. কৃষি শিক্ষা, শ্রম শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে।

১০. শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে বাড়াতে হবে।

১১. পরীক্ষা যাতে কেবল মুখস্থবিদ্যা অথবা নকলবিদ্যার পরিমাপ যন্ত্র না হয় সেভাবে পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একজন ছাত্রের মেধা ও জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করতে হবে।

১২. দেশের সর্বত্র আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে। ছাত্রাবাসসমূহে সরকারি সাবসিডি দিতে হবে।

১৩. সকল ছাত্রের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ব্যায়ামাগার ও খেলার মাঠ, ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. শিল্প, ললিতকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত ও চারুশিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে।

১৫. সর্বস্তরে শিক্ষা হবে মাতৃভাষায়, পাশাপাশি একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী ভাষায় লিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দ্রুত ও বিপুল পরিমাণে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. বাঙালি ছাড়াও অপরাপর জাতিসত্তার মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে ও মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. শিক্ষার কোনো একটি স্তরে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে হবে।

১৯. মাধ্যমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নির্বাচিত সংসদ গঠনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে ও সরকারি আমলা প্রশাসনের অযৌক্তিক ক্ষমতা খর্ব করতে হবে।

২০. মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, গাফিলতি, অকর্মণ্যতা ও দায়িত্বহীনতা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

২১. উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে একটি গণমুখী-বিজ্ঞানভিত্তিক-প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সকলের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, শিক্ষার ব্যয় হ্রাস পায়, শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং একটি গৌরবান্বিত জাতির সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজ বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও দাবিসমূহের সঙ্গে যুক্তিবান কেউই দ্বিমত করতে পারবে না। ছাত্র সমাজের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম সমাজের সামগ্রিক বিপ্লবী রূপান্তরের সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সর্বগ্রাসী সঙ্কট বিরাজ করছে, তাকে টিকিয়ে রেখে দেশে কোনো কল্যাণকর ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। অনেক উন্নত ধনবাদী দেশেই আমরা দেখছি একদিকে কিছু লোকের প্রাচুর্য, অন্যদিকে অগণিত মানুষের গ্লানিময় জীবন; একদিকে ভোগ-বিলাসের সমারোহ, অন্যদিকে বেকারত্ব-দারিদ্র্য-অপুষ্টি-অশিক্ষা-কুশিক্ষা ওই সমাজ ব্যবস্থার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। আসলে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ চালাতে হলে যে অত্যাচার, নির্যাতন, মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হয় তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। আর তাই

বর্তমান বিশ্বে ওইসব শক্তিধর পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধ্বংস ও ক্ষয় সুস্পষ্ট।

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তথা মানুষের ওপর থেকে মানুষের, শ্রেণির ওপর থেকে শ্রেণির শোষণের অবসানই দারিদ্র্যপীড়িত দেশসমূহের প্রকৃত মানবিক মুক্তি অর্জনের পথ। যে সমাজব্যবস্থায় একটি শিশু জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি উজ্জ্বল, সুস্থ ও প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী হয়, যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থাকে না- সেই সমাজ ব্যবস্থার নামই সমাজতন্ত্র। অন্যদিকে যে সমাজ ব্যবস্থা বেকারত্ব, সামাজিক অনাচার, অনিশ্চয়তা ও গ্লানিময় জীবন উপহার দেয়, যে সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের অধিকার দেয় গরিবদের শোষণ করার– সেই সমাজ ব্যবস্থাই পুঁজিবাদ।

এই অবস্থায় আমরা মনে করি, সর্বগ্রাসী সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তির জন্য, দেশের অগ্রগতির জন্য সমাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। আজকের ছাত্র সমাজকে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে যতটুকু প্রগতির ধারা সূচিত হয়েছিল, তাও নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল-সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের ফলে তা বাধাগ্রস্ত ও বিপরীতমুখী হয়েছে। দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী শক্তির তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বারবার সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানি আমলের পুঁজিবাদী, স্বৈরাচারী ধারায় তারা দেশকে আটকে রাখতে চায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতায় যারাই থাকুক না কেন সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে, জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি তথা সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরসহ সকল শোষিত শ্রেণির পাশাপাশি ছাত্র সমাজকেও নতুন বিপ্লবী চেতনায় সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জাতীয় কর্মসূচি

দেশের আপামর জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে কোনো দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর বিশেষত গরিব-মেহনতি মানুষের মুক্তি এবং সুখী-সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশকে অগ্রসর করতে হবে। ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতম করার নীতি নয়, দরিদ্র-মেহনতি-মধ্যবিত্ত মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় খাতকে প্রধান করে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন করতে হবে। বৃহৎ শিল্প, কুটির শিল্প ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। কৃষি, বিশেষ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ভূমি-সংস্কার, জমির সিলিং নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি গরিব কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন এবং কৃষকের ওপর সকল প্রকার জোতদারি-মহাজনি ও গ্রাম্য টাউটদের শোষণ বন্ধ করতে হবে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে। সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং নতুন ধরনের বণ্টন নীতি চালু করতে হবে।

সমাজের সর্বস্তর থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি ও মুনাফাখোরি বন্ধ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের, স্বাধীনতার শত্রু ও জনগণের শত্রুদের উচ্ছেদ করতে হবে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও দেশরক্ষা বাহিনী থেকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক ও জনস্বার্থবিরোধী ব্যক্তিদের অপসারণ করে দেশপ্রেম ও সঠিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। গণদুশমনরা যাতে দেশের ও জনগণের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য জনগণের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, নির্ধারিত দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, উপযুক্ত

মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। পর্যায়ক্রমে চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কেউ যেন বিনা চিকিৎসা ও বিনা ওষুধে মারা না যায়- তা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ মানুষ, দরিদ্র মানুষ, নারী সমাজ এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অধিকার, মর্যাদার ও অগ্রগতির পথ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের শোষণের পথ বন্ধ করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক শক্তির সহায়তা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা জনগণের ওপর ধনীদের শোষণের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ-জাতি গঠনের পথ ও নীতি নেয়া হয়েছে, আমাদের দেশেও সে ধরনের পথ গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের বিদ্যমান অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ও ছাত্র ইউনিয়ন

সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা, জাতীয় অধিকার, প্রগতি ও আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কোথাও মানব সভ্যতাবিরোধী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। কোথাও ঘৃণ্য গণহত্যার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিকে নিশ্চিহ্ন পর্যন্ত করে দেয়ার পথ গ্রহণ করে। এরা বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় বিভেদ, জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি করে, অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেয় এবং নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্তে এরা সক্রিয়ভাবে সামিল রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে তার মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বকে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চায়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিপর্যয়ের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে তার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেপরোয়া হয়ে

উঠেছে। মানব জাতির এইসব ঘৃণ্য দুশমনদের প্রতিহত করার জন্য এবং দেশে দেশে মানুষের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সমাজের ঐক্য এবং নিপীড়িত ও মুক্তিকামী জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা।

এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে এবং সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ, বর্ণবাদ ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীনভাবে একাত্মতা ঘোষণা করছে।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (IUS), বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (WFDY) এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ASA)-এর অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ-চক্রান্ত ও যুদ্ধের পাঁয়তারা বন্ধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারমাণবিক অস্ত্রসহ সকল ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান, পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা, বৃহৎ শক্তিগুলোর সামরিক বাজেট হ্রাস করে দরিদ্র দেশসমূহের উন্নতির জন্য তার একাংশ ব্যয়, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ও ঘাঁটি উচ্ছেদ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মানব জাতির কল্যাণে প্রয়োগের জন্য বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রাম জোরদার করতে হবে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রগতির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন : গণ-ছাত্র সংগঠন

ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ব্যাপক ছাত্র সমাজের বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতির প্রশ্নে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অবিচলভাবে এগিয়ে যাবে। স্থির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন কাজ ও ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার

চেতনা সূচিত ও প্রসারিত হয় এবং জীবনপণ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল-সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ছাত্র ও গণআন্দোলনকে প্রগতিশীল ধারায় পরিবর্তন করেছে এবং নতুন চেতনা সঞ্জীবিত করেছে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়ার ক্ষেত্রে সাধ্যমতো অবদান রেখে চলেছে। বাকসর্বস্ব বুলি নয়, এখনো প্রকৃত দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, নিষ্ঠাবান, সৎ এবং আপোসহীন ছাত্র-কর্মী, সংগঠক ও ছাত্র সমাজের সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশের অবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করার সংগ্রাম অগ্রসর করে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাবে। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে– একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকার নিচে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রাম বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অব্যাহত রাখবে।

একটি ব্যাপকভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিজেদের স্বাধীন উদ্যোগ অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অন্যান্য সমমনা-সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অগ্রসর হতে সর্বদাই প্রস্তুত।

আহ্বান

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ছাত্র সমাজের শিক্ষা জীবনের আশু ও দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দেশবাসীর সমস্যা-সঙ্কট দূর করার জন্য ছাত্র সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রসর হবে।

দীর্ঘ আন্দোলন ও আত্মদানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ- ছাত্র সমাজ, বিশেষত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের ধারায় দেশ ও জনগণের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর তীব্র আন্দোলনের সামনে

কোনো প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী গোষ্ঠী টিকে থাকতে পারে না। অতীতের স্বৈরাচারী শাসক ও শোষকদের মতো সকল সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী মহল অবশ্যই পরাভূত হবে। সচেতন কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম, দেশপ্রেম ও আত্মদান, মেধা ও শিক্ষার দ্বারা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। লাখ লাখ শহীদের আত্মদান, কোটি কোটি মানুষের যুগ যুগের লালিত স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না।

তাই আসুন, শহীদের রক্তস্নাত সংগ্রামের পথ ধরে বিজয় ছিনিয়ে আনি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
গঠনতন্ত্র

ধারা ১ ॥ নাম

প্রতিষ্ঠানের নাম 'বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন'।
ইংরেজিতে Bangladesh Students' Union (BSU)।

ধারা ২ ॥ মূলনীতি

প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি।

ধারা ৩ ॥ পতাকা

প্রতিষ্ঠানের পতাকার রং ঘন নীল, আকার ৩ঃ২ এবং অভ্যন্তর দিকস্থ উপরের কোণে ৫ কোণ বিশিষ্ট ৪টি শ্বেত তারকা থাকবে।

ধারা ৪ ॥ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠানের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাই হবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ধারা ৫ ॥ মুখপত্র

প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের নাম **'জয়ধ্বনি'**।

ধারা ৬ ॥ সদস্য

ক. বাংলাদেশের যে কোনো ছাত্র বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিতে বিশ্বাস স্থাপন করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবে।

খ. সদস্যপদ গ্রহণকারীর বয়স কোনোভাবেই ১২ বছরের কম হবে না এবং ছাত্র জীবন শেষ হলেও এক বছর পর্যন্ত সদস্য থাকতে পারবে।

গ. সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ন্যূনতম ২০ টাকা। এর ১২ টাকা প্রাথমিক শাখা, ০৪ টাকা জেলা সংসদ এবং ০৪ টাকা কেন্দ্রীয় সংসদ পাবে।

ঘ. সদস্যপদ হতে পদত্যাগ করার অধিকার সকল সদস্যের থাকবে। পদত্যাগকারী সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত কমিটি ও প্রাথমিক শাখার সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা নাকচ করবে।

ধারা ৭ ॥ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. ছাত্র হিসেবে নিজেকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা, পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা এবং জনগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ভূমিকা রাখা।

খ. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা।

গ. নিজেকে সৎ, নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক, ত্যাগী ও বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ. ছাত্র সমাজ ও জনগণের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করা।

ঙ. ছাত্র সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য তুলে ধরা এবং ব্যাপক ছাত্র সমাজকে প্রতিষ্ঠানের পতাকা তলে সমবেত করা।

চ. সাংগঠনিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

ধারা ৮ ॥ ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের সংশোধন

ক. ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে হলে যে কোনো সদস্য জাতীয় সম্মেলনের অন্তত ১৫ দিন আগে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সংসদের কাছে লিখিতভাবে পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় সংসদ উক্ত প্রস্তাব নিজস্ব অভিমতসহ বিষয় নির্বাচনী সংসদের মাধ্যমে জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপন করবে।

খ. গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে হলে যে কোনো সদস্য গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সম্মেলনের অন্তত ১৫ দিন আগে কেন্দ্রীয় সংসদের কাছে লিখিতভাবে পেশ করবেন।

কেন্দ্রীয় সংসদ উক্ত প্রস্তাব নিজস্ব অভিমতসহ বিষয় নির্বাচনী সংসদের মাধ্যমে জাতীয় সম্মেলনে উত্থাপন করবে।

গ. জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এক-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকলে বিষয় নির্বাচনী সংসদের উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব সম্মেলনে আলোচিত হবে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অন্তত পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলে তা গৃহীত হবে।

ধারা ৯ ॥ সর্বোচ্চ পরিষদ

ক. প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিষদ হবে জাতীয় সম্মেলন।

খ. সাধারণভাবে এক বছর পর পর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। কমপক্ষে এক মাসের বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করতে হবে। জরুরি অবস্থা দেখা দিলে মাত্র ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করতে পারবে এবং এই ধরনের জরুরি সম্মেলনে কেবল প্রতিনিধিরাই উপস্থিত থাকতে পারবেন।

ধারা ১০ ॥ প্রতিনিধি নির্বাচন

ক. প্রত্যেক জেলা থেকে প্রথম ১শ' জন প্রাথমিক সদস্যের জন্য দু'জন এবং পরবর্তী প্রতি ১শ' জন সদস্যের জন্য একজন করে এবং যে কোনো ভগ্নাংশের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। প্রতিনিধিগণ জেলা কমিটির সভায় নির্বাচিত হবেন।

খ. কেন্দ্রীয় সংসদ বা কেন্দ্রীয় সংসদের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী জাতীয় সম্মেলনে সর্বোচ্চ আরো ৩০ জন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবে। জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ পদাধিকারবলে সম্মেলনের প্রতিনিধি হবেন।

ধারা ১১ ॥ পর্যবেক্ষক নির্বাচন

জাতীয় সম্মেলনে পর্যবেক্ষক আসার ব্যবস্থা থাকবে। পর্যবেক্ষকগণ জেলা সংসদের সভায় নির্বাচিত হবেন। পর্যবেক্ষক সংখ্যা সংশ্লিষ্ট সম্মেলনের প্রতিনিধি সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। তবে কেন্দ্রীয় সংসদ বা কেন্দ্রীয় সংসদের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী সর্বোচ্চ আরো ৫০ জন পর্যবেক্ষক মনোনীত করতে পারবে।

ধারা ১২ ॥ জাতীয় পরিষদ

ক. জাতীয় সম্মেলন দুই জাতীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত করবে। এই জাতীয় পরিষদ হবে দুই জাতীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিষদ। এই ফোরাম সংগঠনের আশু করণীয় নির্ধারণ করে তা কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদকে নির্দেশ দেবে। জাতীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদের কাজ-কর্মের রিপোর্ট শুনবে এবং তা গ্রহণ বা নাকচ করবে। জাতীয় পরিষদের উক্ত কাজ-কর্মের জন্য জাতীয় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জাতীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ. জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১৪১। কেন্দ্রীয় সংসদের সকল সদস্য জাতীয় পরিষদের সদস্য হবেন। জাতীয় পরিষদে প্রতি সাংগঠনিক জেলা থেকে ন্যূনপক্ষে একজন সদস্য থাকবে। জাতীয় সম্মেলনে জেলা সংসদের মাধ্যমে জেলার জাতীয় পরিষদ সদস্য মনোনীত হবেন। অন্যরা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ থেকে জাতীয় সম্মেলনেই মনোনীত হবেন। জাতীয় পরিষদ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে জেলা সংসদ ব্যর্থ হলে বিষয় নির্বাচনী সংসদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

গ. কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী বা সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় পরিষদ সভা আহ্বান করবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫ দিনের এবং জরুরি অবস্থায় চার দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করা চলবে। জরুরি অবস্থায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েই সভা আহ্বান করা চলবে।

ধারা ১৩ ॥ কেন্দ্রীয় সংসদ

জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচিত হবে। কেন্দ্রীয় সংসদ তার কাজ-কর্মের জন্য জাতীয় পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। কেন্দ্রীয় সংসদ দুই জাতীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত হবে।

ধারা ১৪ ॥ গঠনতান্ত্রিক প্রধান

কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি প্রতিষ্ঠানের গঠনতান্ত্রিক প্রধান বিবেচিত হবেন। তিনি জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের মধ্য থেকে একজন সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করে জাতীয় সম্মেলনের কাজ চালাতে হবে।

নির্বাচনী অধিবেশন চলাকালে বিষয় নির্বাচনী সংসদের মধ্য থেকে একজনকে নতুন সভাপতি নির্বাচিত করে জাতীয় সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করতে হবে।

ধারা ১৫ ॥ রিকুইজিশন জাতীয় সম্মেলন

জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের চার ভাগের এক ভাগ প্রতিনিধি লিখিতভাবে জাতীয় সম্মেলনের দাবি জানালে কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দেবেন। লিখিত দাবি জানানোর ২১ দিনের মধ্যে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করতে হবে।

ধারা ১৬ ॥ কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা

জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা হবে ৪১। এই সংসদে ঢাকা ও কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ থেকে ন্যূনপক্ষে ২১ জন সদস্য থাকবেন। বিদায়ী সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নতুন সংসদের সদস্যপদ লাভ করবেন।

ধারা ১৭ ॥ কেন্দ্রীয় সংসদের দপ্তরসমূহ

জাতীয় সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, আটজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, তিনজন সহকারী সাধারণ সম্পাদক, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন দপ্তর সম্পাদক, একজন শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, একজন স্কুল ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, একজন আন্তর্জাতিক বিভাগীয় সম্পাদক, একজন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, একজন সাংস্কৃতিক সম্পাদক, একজন সমাজকল্যাণ সম্পাদক, একজন ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত করবে।

ধারা ১৮ ॥ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতি জাতীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় সংসদ ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করবেন। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সচেষ্ট হবেন। সাধারণ সম্পাদককে তিনি পরামর্শ দান করবেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদসহ বিভিন্ন ফোরামের সভা আহ্বান সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দিতে পারবেন। সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করলে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবেন। এছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যেসব দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়, তা তিনি পালন করবেন।

ধারা ১৯ ॥ সহ-সভাপতি

সহ-সভাপতিগণ সভাপতির কাজ পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি হিসেবে সভার কাজ চালাবেন। সভাপতি ১৫ দিনের অধিক সময়ের জন্য কাজে অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতিদের মধ্য থেকে একজন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে কাজ পরিচালনা করবেন। ঢাকাস্থ সহ-সভাপতিগণ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হবেন। অন্য সহ-সভাপতিগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ২০ ॥ সাধারণ সম্পাদক

সভাপতির নির্দেশে অথবা পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় সংসদ ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করবেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্র, সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবাবলী সংরক্ষণে যত্নবান হবেন। প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সব সময় খোঁজ-খবর রাখবেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। এই সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তার সাহায্য নেবেন। এছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যেসব দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়, তা তিনি পালন করবেন।

ধারা ২১ ॥ সহকারী সাধারণ সম্পাদক

সহকারী সাধারণ সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদককে কাজ পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে একজন সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে সভার রিপোর্ট পেশ করবেন। সাধারণ সম্পাদক ১৫ দিনের অধিক সময়ের জন্য কাজে অনুপস্থিত থাকলে, সহকারী সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে একজন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ২২ ॥ সাংগঠনিক সম্পাদক

সাংগঠনিক সম্পাদক প্রতিষ্ঠানকে সুবিস্তৃত করতে এবং সাংগঠনিক কাজের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রক্ষায় তৎপর থাকবেন। বিভিন্ন জেলায় সংগঠন, নতুন কমিটি গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি খোঁজ-খবর রাখবেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

ধারা ২৩ ॥ কোষাধ্যক্ষ

কোষাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

ধারা ২৪ ॥ দপ্তর সম্পাদক

দপ্তর সম্পাদক দপ্তরের কাজ-কর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ধারা ২৫ ॥ শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক

শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের রাজনৈতিক মান উন্নয়ন, পাঠচক্র, সেমিনার, ক্যাম্প প্রভৃতি আয়োজনের উদ্যোগ নেবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনাসমূহের গ্রন্থনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধারা ২৬ ॥ স্কুল ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক

স্কুল ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক অধিক সংখ্যক স্কুল ছাত্রকে প্রতিষ্ঠানে সমবেত করতে এবং স্কুল ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সব রকম প্রচেষ্টা চালাবেন।

ধারা ২৭ ॥ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বিভাগীয় সম্পাদক

আন্তর্জাতিক বিভাগীয় সম্পাদক অন্যান্য দেশের এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ছাত্র-যুব সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং প্রসারের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকবেন।

ধারা ২৮ ॥ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রকাশনামূলক বিষয়গুলোর দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ২৯ ॥ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছাত্র সমাজের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধক ও গণমানুষের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাজ-

কর্ম বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকবেন। পদাধিকারবলে তিনি প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক শাখা সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের মূল দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ৩০ ॥ ক্রীড়া সম্পাদক

ক্রীড়া সম্পাদক ছাত্র সমাজের মধ্যে খেলাধুলা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং এই বিষয়ে ছাত্র সমাজের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকবেন।

ধারা ৩১ ॥ সমাজকল্যাণ ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক

সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজ ও প্রয়োজনে দেশবাসীর জনকল্যাণমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনা করবেন। পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তা রক্ষায় কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধারা ৩২ ॥ নির্বাচন পদ্ধতি

সকল পর্যায়ে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ পরিষদে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংসদসমূহ নির্বাচিত হবে। সাধারণভাবে বিদায়ী সংসদের সুপারিশ সাধারণ প্রতিনিধিদের প্রস্তাবের আলোকে বিষয় নির্বাচনী সংসদ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবনার ভিত্তিতে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নতুন সংসদ গঠিত হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সকল প্রতিনিধির সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন প্রকাশ্য বা গোপন মতদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা ৩৩ ॥ কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য

কেন্দ্রীয় সংসদের ঢাকাস্থ সদস্যরা কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। অন্য সদস্যরা নিজ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৩৪ ॥ বিভাগীয় উপ-সংসদ

কেন্দ্রীয় সংসদের বিভাগীয় সম্পাদকরা কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ৩ থেকে ৭ জন সদস্য নিয়ে বিভাগীয় উপ-সংসদ গঠন করতে পারবেন। বিভাগীয় উপ-সংসদগুলোকে কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা ৩৫ ॥ সাংস্কৃতিক শাখা

(কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রযোজ্য)

প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক শাখা 'সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন'। সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন। থানা ইউনিটে সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সংগঠন কর্তৃক নির্বাচিত সংগঠকদের কার্যকরী সদস্য হিসেবে মনোনীত করে অনূর্ধ্ব নয় সদস্যের কার্যকরী পরিষদ গঠন করতে হবে। মাসে অন্তত একবার পরিষদ সভা করতে হবে। সম্পাদক সভার সভাপতিত্ব করবেন। আবৃত্তি, গান, বইপড়া, কর্মসূচি, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা পরিচালনার জন্য কার্যকরী সদস্যরা সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ৩৬ ॥ কেন্দ্রীয় সংসদের সভার নিয়মাবলী

সাধারণভাবে দুই মাস অন্তর একবার কেন্দ্রীয় সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে এই সভা আহ্বান করতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সংসদের সকল সদস্যকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য পৃথকভাবে লিখিত সংবাদ দিতে হবে। ৩৬ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে জরুরি সভা আহ্বান করা চলবে এবং এক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিই মূল বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ৩৭ ॥ কোরাম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি

যে কোনো সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হলে তা কোরাম হিসেবে ধরা হবে। উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কোনো সংসদের কোনো পদ শূন্য থাকলে শূন্যপদ বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদের সভার কোরাম হিসাব করতে হবে।

ধারা ৩৮ ॥ রিকুইজিশন সভা

কেন্দ্রীয় সংসদের এক-চতুর্থাংশ সদস্য কেন্দ্রীয় সংসদের সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে সভাপতির কাছে দাবি উত্থাপন করলে, সভাপতি লিখিত দাবি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করবেন।

ধারা ৩৯ ॥ পদত্যাগ ও শূন্য আসনের নির্বাচন

কেন্দ্রীয় সংসদের কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা পদত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সংসদের যে কোনো শূন্য পদে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিগণের মধ্য হতে অথবা কেন্দ্রীয় সংসদ হতে যে কোনো সদস্যকে উক্ত শূন্য পদে কেন্দ্রীয় সংসদ 'কো-অপ্ট' করে নেবে।

ধারা ৪০ ॥ সভার কার্যধারা

কার্যকরী সংসদের সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। সভায় একই সঙ্গে পরবর্তী করণীয়সমূহ আলোচিত হবে।

ধারা ৪১ ॥ সদস্যপদ বাতিল

কেন্দ্রীয় সংসদের কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা বিনা কারণে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাকে 'কারণ দর্শাও নোটিশ' দেয়া হবে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে তার পদ শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে।

ধারা ৪২ ॥ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

কেন্দ্রীয় সংসদের ঢাকাস্থ কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করবেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১৯। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন রুটিন কাজ পরিচালনায় সম্পাদকমণ্ডলী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন করাই হবে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান কাজ। সম্পাদকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে জেলা, প্রয়োজনবোধে থানা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর ক্ষমতা নেই, কিন্তু বিশেষ জরুরি অবস্থায় কেন্দ্রীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুরূপ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ চালাতে পারবে। সম্পাদকমণ্ডলীর কাজের ধারা হবে মূলত যৌথভাবে রুটিন মতো কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং এজন্য নিয়মিত সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন এবং সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ধারা ৪৩ ॥ কেন্দ্রীয় কার্যালয়

কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যালয়ের অবস্থান হবে রাজধানী ঢাকা শহরে।

ধারা ৪৪ ॥ জেলা সম্মেলন

ক. জেলাসমূহের সর্বোচ্চ পরিষদ হবে জেলা সম্মেলন। জাতীয় সম্মেলনের মতো সাধারণভাবে এক বছর পরপর জেলা সম্মেলন হবে। প্রয়োজনে ছয় মাসে একবার জেলা সম্মেলন করা চলবে। জেলা সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রতি প্রাথমিক শাখা সাংগঠনিক থানা শাখা, আঞ্চলিক শাখাসমূহের প্রথম ২৫ জন প্রাথমিক সদস্যের মধ্য থেকে দু'জন, পরবর্তী প্রতি ২৫ জনের জন্য একজন করে এবং ভগ্নাংশের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট কমিটি সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। জেলা সম্মেলনে জেলা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যবেক্ষক আসার ব্যবস্থা থাকবে।

খ. জেলা সম্মেলন প্রায় সব বিষয়েই কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে জেলা সম্মেলন

আহ্বান করা চলবে। জরুরি অবস্থায় ৭ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে জেলা সম্মেলন আহ্বান করা চলবে।

ধারা ৪৫ ॥ জেলা সংসদ

জেলা সম্মেলন জাতীয় সম্মেলনের মতো একইভাবে একটি জেলা সংসদ নির্বাচন করবে এবং জেলা সংসদের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৩৩। জেলা সংসদ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হতে কেন্দ্রীয় সংসদের মতো কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক বিভাগীয় সম্পাদক ব্যতীত) নির্বাচন করে তা জেলা সম্মেলনে অনুমোদন করে নেবে। জেলা সম্মেলন প্রয়োজন মনে করলে কোনো কোনো কর্মকর্তার সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

ধারা ৪৬ ॥ জেলা সংসদের কার্যধারা

ক. জেলা সংসদের কর্মকর্তাগণ জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদের কর্মকর্তাদের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্য সকল বিষয়ে তাদের কার্যকলাপ জেলার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের কর্মকর্তাদের মতোই হবে।

খ. জেলা সংসদের সভা আহ্বান, জরুরি সভা আহ্বান ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্রীয় সংসদের অনুরূপ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ৭ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে জেলা সংসদের সভা আহ্বান করা চলবে এবং জরুরি সভার ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিই যথেষ্ট হবে।

গ. কেন্দ্রীয় সংসদের অনুরূপ জেলা সংসদেও একটি সম্পাদকমণ্ডলী থাকবে এবং এর কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরূপ হবে।

ঘ. জেলা সংসদের ৫ ভাগের ১ ভাগ সদস্য (ন্যূনপক্ষে ৭ জন) লিখিত দাবি জানালে কেন্দ্রীয় সংসদের মতো এ ক্ষেত্রেও জেলা সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সভা আহ্বানের নির্দেশ দেবেন।

ঙ. জেলা সংসদের দপ্তর সাধারণভাবে জেলা সদরে থাকবে।

ধারা ৪৭ ॥ সাংগঠনিক জেলা এবং থানার মর্যাদাসম্পন্ন সংগঠন

ক. প্রশাসনিক জেলাসমূহ ছাড়াও রাজধানী ঢাকা মহানগর সংসদ জেলা সংসদের মর্যাদা পাবে।

খ. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা সম্পন্ন জেলা সংসদ গঠন করতে পারবে।

গ. প্রশাসনিক থানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, অনার্স কলেজ, স্নাতকোত্তর কলেজ, বি.আই.টি, কৃষি কলেজ, মেডিকেল কলেজ সংগঠন থানা শাখার মর্যাদা লাভ করবে।

ঘ. ঢাকাস্থ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সম্মিলিত জেলা সংসদের মর্যাদা পাবে। প্রত্যেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদাভাবে থানার মর্যাদা লাভ করবে।

ধারা ৪৮ ॥ মূলনীতির প্রশ্নে জেলা সংগঠন

ক. জেলা সম্মেলন অথবা জেলা সংসদ মূলনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় সম্মেলন অথবা কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। জেলা সংসদ বা জেলা সম্মেলনের কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সংসদ বা জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাবের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে জেলা সংগঠনের প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ. জেলা সংসদ থানা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। থানা সংগঠন না থাকলে জেলা সংসদ ওই থানার অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক শাখাগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করবে। জেলা সংসদ থানা শাখার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, প্রয়োজনবোধে সরাসরি সকল প্রাথমিক শাখা বা আঞ্চলিক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।

ধারা ৪৯ ॥ থানা শাখা

ক. থানা শাখায় একটি সংসদ থাকবে। থানা সংসদের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২৭। জেলা সংসদের মতো একই পদ্ধতিতে থানা শাখার কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হবেন।

খ. জেলা সংসদের মতো একইভাবে থানা শাখার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে ৫ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করা চলবে এবং জরুরি অবস্থায় ১৩ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিই যথেষ্ট হবে।

গ. থানা শাখা জেলা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবে।

ঘ. থানা শাখা, প্রাথমিক শাখা ও আঞ্চলিক শাখাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে।

ধারা ৫০ ॥ আঞ্চলিক শাখা

ক. থানা শাখার কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে আঞ্চলিক শাখা গঠন করা চলবে। আঞ্চলিক শাখার একটি সংসদ থাকবে।

খ. একই অঞ্চলে একাধিক প্রাথমিক শাখা থাকলে একটি আঞ্চলিক শাখা গঠন করা চলবে। এই আঞ্চলিক শাখা সংশ্লিষ্ট থানা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবে।

গ. আঞ্চলিক শাখার একটি সংসদ থাকবে। তা উক্ত অঞ্চলের সাধারণ সভায় গঠন করা চলবে অথবা বিভিন্ন শাখা হতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিনিধি সভা করেও গঠন করা চলবে। আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২৫ এবং থানা শাখার অনুরূপ কর্মকর্তা থাকবে অথবা প্রয়োজনবোধে কর্মকর্তার সংখ্যা হ্রাস করাও চলবে। সাধারণভাবে ৩ দিন এবং জরুরি অবস্থায় ছয় ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে আঞ্চলিক কমিটির সভা আহ্বান করা চলবে। বছরে একবার আঞ্চলিক সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে।

ধারা ৫১ ॥ প্রাথমিক শাখা

ক. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে ১১ জন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ হলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শাখা গঠন করা চলবে।

খ. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কলেজসমূহে একাধিক ছাত্রাবাস থাকলে সেখানে ছাত্রাবাস ভিত্তিতে প্রাথমিক শাখা গঠিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে প্রয়োজনে বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) ভিত্তিতে প্রাথমিক শাখা গঠন করা চলবে।

গ. প্রাথমিক শাখায় একটি সংসদ থাকবে। শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সদস্যদের একটি সাধারণ সভায় উক্ত সংসদ নির্বাচিত হবে এবং এর সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ২৩। এর কর্মকর্তা সংখ্যা আঞ্চলিক শাখার অনুরূপ হবে অথবা প্রয়োজনবোধে আরো হ্রাস করা চলবে। দুই দিনের বিজ্ঞপ্তি এবং জরুরি অবস্থায় ৩ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করা চলবে। বছরে অন্তত দুই বার প্রাথমিক শাখার সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে।

ঘ. কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে ০৭ জন প্রাথমিক সদস্য হলে সেখানে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা ৫২ ॥ অনাস্থা প্রস্তাব

প্রতিষ্ঠানের যে কোনো স্তরে যে কোনো কর্মকর্তা বা সমগ্র কার্যকরী সংসদের ওপর অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সংশ্লিষ্ট সম্মেলনের এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধি লিখিত দাবি জানাবে এবং উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি দ্বারা সমর্থিত হলে তা গৃহীত হবে। অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সংশ্লিষ্ট সম্মেলনের শতকরা ৫০ জন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে হবে।

ধারা ৫৩ ॥ গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত নিয়মাবলী সম্পর্কে কোনো বিতর্ক বা মতবিরোধ দেখা দিলে তা কেন্দ্রীয় সংসদ বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত দেবে তা মেনে নিতে হবে। গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংসদের। কিন্তু গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদের যে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা জাতীয় সম্মেলনের।

ধারা ৫৪ ॥ বিষয় নির্বাচনী সংসদ

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে যে সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হবে তার সকল প্রস্তাবাবলি একটি বিষয় নির্বাচনী সংসদের মাধ্যমে পেশ করতে হবে।

সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে ইচ্ছুক সদস্য প্রস্তাবটি প্রথমে বিষয় নির্বাচনী সংসদের কাছে পেশ করবেন। বিষয় নির্বাচনী সংসদ যদি কোনো সদস্যের কোনো প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন না করে তাহলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রয়োজনীয় কৈফিয়ত দাবি করতে পারেন। এভাবে বিতর্কমূলক প্রস্তাবটি সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত বা নাকচ হতে পারে। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী সংসদ নির্বাচন করতে হবে।

ধারা ৫৫ ॥ প্রচলিত রীতি

যেসব বিষয়ে গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ নেই, উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রচলিত রীতিসমূহ অনুসরণ করা চলবে।

ধারা ৫৬ ॥ বহিষ্কার, অব্যাহতি, বিলুপ্তি

ক. কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি, প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বিরোধী কোনো ক্ষতিকর কাজ করলে সংশ্লিষ্ট (কেন্দ্রীয়, জেলা, থানা বা প্রাথমিক) সংসদ তা বিবেচনা করে অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সকল ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ শাস্তি হবে সংগঠন থেকে বহিষ্কার। সংশ্লিষ্ট কার্যকরী সংসদ এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারী, কিন্তু কোনো সদস্যকে স্থায়ীভাবে সংগঠন হতে বহিষ্কার করতে হলে তা সংশ্লিষ্ট সম্মেলনে (বাৎসরিক বা ষান্মাসিক) অনুমোদিত হতে হবে।

খ. ঊর্ধ্বতন সংসদের কোনো সদস্যকে নিম্নতর সংসদ শাস্তি প্রদান করতে পারবে না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নতর সংসদ প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন সংসদের কাছে শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে। ন্যূনতম সংসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সদস্য সম্পর্কে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে ঊর্ধ্বর্তন সংসদ ওই বিষয়ে নিম্নতর সংসদকে নির্দেশমূলক সুপারিশ পাঠাতে পারবে। কিন্তু ওই সুপারিশ মোতাবেক নিম্নতর সংসদ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী না হলে বা শাস্তি প্রদান না করলে ঊর্ধ্বতন সংসদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ. প্রয়োজনবোধে শুধু কেন্দ্রীয় সংসদ সংগঠনের যে কোনো স্তরের সদস্যের বিরুদ্ধে সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পর্যায়ের সংসদ গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, নীতিমালা, কর্মসূচি বা ঐতিহ্য-বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বা কার্যাবলিতে অংশ নিলে বা যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সংসদ যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে নিম্নতর সংসদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে ওই সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা।

ঘ. যে কোনো সদস্যের বা সংসদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন সংসদসমূহের কাছে আপিল করার অধিকার আছে। আপিলের রায় না হওয়া পর্যন্ত নিম্নতম সংসদের সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

শপথনামা

লাখো লাখো শহীদ যাঁরা ভাষা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ ও স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'জীবন' কে উৎসর্গ করেছেন- তাঁদের রক্তের নামে আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, সেই সকল বীর শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থেকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে চলবো।

আমরা আরো শপথ গ্রহণ করছি যে, এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে প্রয়োজনবোধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবো। শিক্ষা-গণতন্ত্র-সমাজপ্রগতির লড়াইকে এগিয়ে নেবো- শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নে-

আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো
আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো
আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।
শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। জিন্দাবাদ।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সঙ্গীত
কথা : আকতার হুসেন
সুর : শেখ লুৎফর রহমান

আমরা তো ঐক্যের দৃঢ় বলে বলীয়ান
শোষণের কারাগার ভাঙবোই
শিক্ষার আলোকে প্রতি গৃহকোণকে
রাঙবোই আমরা তো রাঙবোই।

হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই
হাতে হাত রাখো ভাই
দৃঢ়পণে জাগো ভাই।

আগে বাড়ো আগে বাড়ো
দুর্জয় দৃঢ়তায় আর নয় দেরি নয়
আমাদের হবে জয়
এসো মিলি মুক্তির পতাকায়॥

আমরাতো শান্তির দুর্বার সৈনিক
শুনি না তো আহ্বান ধ্বংসের
আমরা তো আমরণ প্রগতির পক্ষে
গড়বোই বিশ্বতো সাম্যের
হাতে হাত রাখো ভাই (...)

আমরাতো স্বদেশের দুর্জয় প্রহরী
স্বদেশের মাটি তাই গরিয়ান
আমাদের অবিরাম শ্রমে আর ফসলে
ফোটাবোই স্বদেশের মুখে গান
হাতে হাত রাখো ভাই (...)

আমরা তো মিলেছি পৃথিবীর লাঞ্ছিত
সংগ্রামী মানুষের কাফেলায়
যেখানেই মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই
আমরা তো মিলি লৌহ দৃঢ়তায়
হাতে হাত রাখো ভাই(...)॥

গানের স্বরলিপি

তাল : দাদরা (দ্রুততলয়)

মার্চের ছন্দে

IIগা -া -াIগা -া সাIরা -া -াIসা -া -াI
আ ০ ম্ রা ০ তো ঐ ০ ক্ কে ০ র্

Iগা -া গাIগা -া মাIরা -া গাIমা -া -াI
দৃ ০ ঢ় ব ০ লে ব ০ লী য়া ০ ন্

Iপা -া পাIপা -া -াIপা -া ধাIপা -া গাI
শো ০ ষ ণে ০ র্ কা ০ রা গা ০ র্

Iপা -া -াIপা -া -াI-া -া -াI-া -া -াI
ভা ০ ঙ্ বো ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

Iপা -া -াIপা -া রাIরা -া গাIরা -া -াI
শি ০ ক্ খা ০ র্ আ ০ লো কে ০ ০

Iমা -া মাIমা -া গাIরা সা ন্াIন্ -া -াI
প্র ০ তি গৃ ০ হ কো ০ ণ্ কে ০ ০

I{পা -া -াIগা -া -াIরা -া -াIসা -া ন্াI
রা ০ ঙ্ বো ০ ই আ ০ ম্ রা ০ তো
Iধা -া ন্াIসা -া -াI(-া -া -াI-া -া -া)}]I
রা ০ ঙ্ বো ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

I-া -া পাIপা -া ধাIপা -া মাIগা -া মাI
০ ০ হা তে ০ ০ হা ০ ত্ রা ০ খো

Iপা -া -াIর্সা -া ন্াIধা -া -াI-া -া -াI
ভা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

I-া -া পাIপা -া ধাIপা -া মাIগা -া মাI
০ ০ দৃ ঢ় ০ প ণে ০ ০ জা ০ গো

Iপা -া -াIর্সা -া ন্াIধা -া -াI-া -া -াI
ভা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

I{পা -া পাIর্সা -া -াIপা -া পাIর্সা -া -াI
হা ০ তে হা ০ ত্ রা ০ খো ভা ০ ই

Iপা -া পাIর্সা -া র্সাIপা -া পাIর্সা -া -াI}I
দৃ ০ ঢ় প ০ ণে জা ০ গো ভা ০ ই

Iমা মা মাIমা মা -াIগা -া মাIধা -া -াI
আ গে বা ড়ো আ ০ গে ০ বা ড়ো ০ ০

Iপা -া ধাIপা -া মাIপা -া মাIগা -া -াI
দু ০ র্ জ ০ য় দৃ ০ ঢ় তা ০ য়

Iরা -া গাIমা -া -াIগা -া মাIধা -া -াI
আ ০ র্ ন ০ য় দে ০ রি ন ০ য়

Iপা -া ধাIপা -া মাIপা -া মাIগা -া -াI
আ ০ মা দে ০ র্ হ্ ০ বে জ ০ য়

Iপা -া পাI
I{ধা -া ধাIগা -া গাIরা -া -াIসা -া ন্াI
এ ০ সো মি ০ লি মু ০ ক্ তি ০ র্

Iধা -া ন্াIসা -া -াI-া -া -াI-া -া -াI}]I
প ০ তা কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

IIগা -া -াIগা -া সাIরা -া গাIমা -া -াI
আ ০ ম্ রা ০ তো শা ০ ন্ তি ০ র্

Iপা -া ধাIপা -া মাIপা -া মাIগা -া -াI
দু ০ র্ বা ০ র্ সো ০ ই নি ০ ক্

Iগা -া মাIগা -া রাIসা -া রাIসা -া ন্াI
শু ০ নি না ০ তো আ ০ হ্ বা ০ ন্

Iধা -া ন্াIধা -া -াI-া -া -াI-া -া -াI
ধ্ব ০ ং সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

Iধা -া -াIরা -া রাIরা -া রাIমা -া -াI
আ ০ ম্ রা ০ তো আ ০ ম র ০ ণ্

Iপা -া ধাIপা -া মাIধা -া -াIপা -া -াI
প্র ০ গ তি ০ র্ প ০ ক্ খে ০ ০

Iপা -া -াIমা -া মাIগা -া -াIরা -া সাI
গো ০ ড় বো ০ ই বি ০ শ্ শ ০ তো

Iগা রা রাIসা -া -াI
সা ০ ম্ মে ০ র্

এরপরই 'গড়বোই বিশ্বতো সাম্যের'-এ লাইনটি উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান ধরতে হবে। শ্লোগানে 'সাম্যের' শব্দটি দু'বার বলতে হবে। দ্বিতীয় অন্তরার সুর প্রথম অন্তরার অনুরূপ, তবে কোনো শ্লোগান হবে না। তৃতীয় অন্তরার সুরও একই, তবে 'আমরা তো মিলি লৌহ দৃঢ়তায়'-এ লাইনটি উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান ধরতে হবে। শ্লোগানে 'দৃঢ়তায়' শব্দটি দু'বার বলতে হবে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী এ গানের সুরকার শেখ লুৎফর রহমানের মৃত্যুর ৭ দিন আগে তাঁর বাসভবনে তাঁরই সহযোগিতা নিয়ে এ স্বরলিপি প্রণয়ন করা হয়। তিনি এ গানটিতে উল্লিখিত নির্দেশ প্রদান করে শ্লোগান যুক্ত করেন এবং 'হো হো' সুর থেকে বাদ দেন।